কোয়ান্টাম অপটিকসে নোবেল আইসিটির সম্ভাবনা

আবীর হাসান

সবাইকে অবাক করে দিয়ে এবার পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পেল এমন একটি বিষয়, যা সরাসরি কমপিউটার বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত। অনেকেরই ধারণা ছিল এবার কোনো ব্যক্তি নন, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পাবে একটি প্রতিষ্ঠান– সুইজারল্যান্ডের সার্ন। গবেষণা প্রতিষ্ঠানটিতে এ বছরই হিগস-বোসন কণার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তবে সদ্য আবিষ্কৃত এই কণার স্থায়িত্ব এবং কার্যকারিতা নিয়ে এখনও সন্দেহ কাটেনি বিজ্ঞানীদের। সে কারণেই হয়তো নোবেল পুরস্কারের শিকে ছিঁড়েছে কোয়ান্টাম অপটিকসের ভাগ্যে। 'শিকে ছেঁড়ার' কথা বললাম এ কারণে– বরাবরই তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পর্কিত গবেষণা বা অর্জন নোবেল কমিটির কাছে অনেকটা উপেক্ষিতই থেকে যায়। কমপিউটার উদ্ভাবনের পর গত প্রায় ষাট বছরে মাত্র দু'বার তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি খাতে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে।

তবে এ বছর মনে হচ্ছে, অনেকটাই যেনো অবধারিতভাবে নোবেল অর্জন করেছে 'কোয়ান্টাম অপটিকস'। এর ওপর আবার দু'দেশের দুই বিজ্ঞানী। একজন ফ্রান্সের, নাম তার সার্জ হ্যারোস, অন্যজন যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড। দু'জনের জাতীয়তা যেমন আলাদা, তেমনি কর্মক্ষেত্র এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানও আলাদা। তবে মিল হলো দু'জনই শিক্ষক ও গবেষক। আর গবেষণাও করেন একই বিষয় নিয়ে।

তাদের গবেষণাকর্ম সম্বন্ধে নোবেল কমিটি বলেছে– এ দু'জনের গবেষণার ফল যোগাযোগ প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করবে এবং কমপিউটিংয়ের ক্ষেত্রে বিপ-ব ঘটাবে। কেমন করে? বিষয়টা যেনো অনেকটা কল্পলোকের গালগল্পের মতো। আলোর গতিতে তথ্য চলাচল এবং পারমাণবিক তেজ দিয়ে কমপিউটার চালানোর কথা এতদিন শুধু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনীর বিষয়ই ছিল। নব্বই দশকের শেষ ভাগ থেকে 'তাত্ত্বিক ধারণা' নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন পদার্থ বিজ্ঞানীরা। এর মূলে আছে সূক্ষ্মতম আণবিক পর্যায়ে ফোটন কণার আবরণ এবং চার্জযুক্ত পরমাণুর দ্রুততর গাণিতিক হিসাবের সক্ষমতা।

সার্জ হ্যারোস

ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড

তাত্ত্বিক সম্ভাবনা নিয়েই গবেষণা শুরু করেছিলেন হ্যারোস। আসলে তিনি মরক্কান বংশোদ্ভূত ফরাসি। জন্মও মরক্কোয় ১৯৪৪ সালের ১ সেপ্টেম্বরে। তার আইনজীবী বাবা ১৯৫৬ সালে ফ্রান্সে অভিবাসী হন। ১৯৬৭ সাল থেকে সার্জ হ্যারোস ফ্রান্সের ন্যাশনাল রিসার্চ সায়েন্টিফিক সেন্টারে গবেষক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৭৫ সালে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এক বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ডেও অধ্যাপনা করেছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি গবেষণাও চালিয়ে গেছেন তিনি। এখন কলেজ দ্য ফ্রান্সের প্রশাসনিক প্রধান হলেও হ্যারোস গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড ১৯৪৪ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি ক্যালিফোর্নিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হন। ১৯৭০ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এখন অধ্যাপনা করছেন কলোরাডোতে, পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন গবেষণা।

সার্জ হ্যারোস এবং ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড কল্পলোকের বিষয়কে বাস্তবে নামিয়ে এনেছেন। পরমাণুর ফোটন কণার তথ্যবাহক প্রবণতার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেন হ্যারোস। তিনি ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন, তথ্য বহনে এখন অপটিক্যাল ফাইবার প্রতি বিটে যে পরিমাণ তথ্য বহন করতে পারে, তার তুলনায় প্রায় পঞ্চাশ গুণ বেশি তথ্য পরিবহন প্রায় দ্বিগুণ গতিতে পরিবহন করতে সক্ষম ফোটন কণা। বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সমস্যায় ভুগছে বড় বড় ফাইল বহনের সক্ষমতা ও গতি নিয়েই। সার্জ হ্যারোস যা অর্জন করেছেন তা হলো– ফোটন কণার তেজকে নিয়ন্ত্রণের উপায়। এ নিয়ন্ত্রণটা সব ধরনের তথ্যবিষয়ক ফাইল ধারণ, সঙ্কোচন ও বহনের জন্য। এতদিন ফোটন কণার অতি অস্থিরতা মারাত্মক অস্ত্রের ব্যাপারেই বিজ্ঞানীদের ভাবিয়েছে, বড়জোর এরা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ তরঙ্গ সৃষ্টি পর্যন্ত আসতে পেরেছেন। সেটাও এখন পর্যন্ত সম্ভাবনার পর্যায়ে রয়ে গেছে। কিন্তু হ্যারোস এই বিষয়টিকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে গেছেন। তিনি ইতোমধ্যে প্রমাণ করেছেন, আপাতদৃষ্টিতে ▸

ফোটন কণাকে যত অস্থির মনে হয় ততটা নয়, বরং এর গাণিতিক সঙ্কেত তৈরির ক্ষমতা অতি উঁচুমাত্রার। এই বিষয়টিকেই উৎস হিসেবে ধরে বিভিন্ন ধরনের এবং আকারের ফাইল তিনি নতুন মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাত এবং পরিবহন করাতে সক্ষম হন।

অন্যদিকে ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড যে গবেষণা করেছেন তা চার্জযুক্ত পরমাণু নিয়ে। অতি সূক্ষ্ম এই বস্তু কণিকার সুইচিং ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। আমরা জানি, কমপিউটার যে পদ্ধতিতে গাণিতিক হিসাব করে তা এই সুইচিং পদ্ধতিনির্ভর। প্রসেসর এই কাজটিই করে। কমপিউটিংয়ের গতির বিষয়টিও এর ওপরই নির্ভরশীল। শুধু গতি বা শক্তির বিষয়ই নয়, কমপিউটারের নির্ভুল কর্মকাণ্ড স্মৃতি এবং আকারের বিষয়গুলোও এর ওপর নির্ভরশীল। কোয়ান্টাম কমপিউটারের সম্ভাবনার কথা যখন বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, তখন এরা জানিয়ে রেখেছিলেন 'বুদ্ধিমান' কমপিউটার তখনই পাওয়া যাবে, যখন অতিসূক্ষ্ম বস্তুকণার প্রভাবে চালানো হবে কমপিউটার। অভাবনীয় দ্রুতগতিতে সঙ্কেত তৈরি এবং স্মৃতিতে তা ধারণ তখনই করা যাবে, যখন পারমাণবিক তেজ ক্ষতিকারক বিকিরণ না করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করবে। এই নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিকেই প্রায় সম্ভব করে এনেছেন ডেভিড ওয়াইনল্যান্ড।

এখন কল্পনা করুন ওয়াইনল্যান্ডের কমপিউটিং শক্তি আর হ্যারোসের তথ্য পরিবহন প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটলে কী হবে?

এখনকার স্ট্যান্ডার্ড কমপিউটারের তুলনায় কমপিউটিং গতি বাস্তবে অন্তত দু'শ' গুণ। এ দিয়ে প্রচলিত ধরনের তথ্য প্রসেসিং হবে অতি দ্রুতগতিতে এবং এখনকার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারবে কমপিউটার। অর্থাৎ যে বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত কমপিউটারের আওতায় আসেনি বা আনা যাচ্ছে না, সেগুলোকে নিয়েও কাজ করা যাবে। মানবীয় এবং প্রাকৃতিক অথবা মহাজাগতিক অতি সূক্ষ্ম সঙ্কেতগুলোকে গাণিতিক সঙ্কেতের হিসাবের মধ্যে নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর ফলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের ক্ষেত্রে ঘটবে অভূতপূর্ব উন্নতি। এখনও পর্যন্ত যে বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি সে বিষয়গুলোও অনেকটাই এসে যাবে নিয়ন্ত্রণে। যেমন মানুষের কথা এবং হাঁটার ধরন, অভিব্যক্তি ইত্যাদি নিয়ে যে সমস্যা, সে সমস্যাগুলো মোকাবেলা করা যাবে সহজেই। কারণ, এই উলি-ঝিত বিষয়গুলোকে গাণিতিক সঙ্কেতে পরিণত করা যাবে। প্রাথমিক অবস্থায় অভিব্যক্তি এবং কথা শোনা-বোঝার প্রক্রিয়ার যান্ত্রিকীকরণকে যতটা সরল মনে করা হয়েছিল এগুলো কিন্তু তেমন নয়– বেশ জটিল এবং অনেক বেশি দ্রুত ও নির্ভুল গাণিতিক সঙ্কেতের প্রয়োজন হয় প্রসেসিং করতে। একই ধরনের ব্যাপার ঘটে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে। এখনকার সুপারকমপিউটার যে পদ্ধতিতে এসব তথ্য প্রক্রিয়াকরণ করে সে পদ্ধতি ঠিক বাস্তবতার সামে খাপ খায় না। কারণ, যতই শক্তিশালী হোক কমপিউটার, প্রকৃতি যেনো তারচেয়ে বেশি মায়াবী-ছলনাময়ী। এক্ষেত্রে কোয়ান্টাম কমপিউটিং শক্তি প্রকৃতির ছলাকলার সঙ্কেতগুলোকে ধরতে পারবে অনেক সূক্ষ্মমাত্রায়।

কোয়ান্টাম অপটিকস এমন একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে, যা অতি সূক্ষ্ম কণার আলোকসঙ্কেত হয়ে ওঠার সমতুল্য সাফল্যের পথ নির্দেশ করছে। বিশ্বে এখন পর্যন্ত এই সঙ্কেতটিই মানবীয় জ্ঞান মোতাবেক সবচেয়ে তেজ বিকিরণকারী তথা শক্তি সঞ্চারকারী। আর এতদিন একে শুধু বিধ্বংসী ও ইন্ধনশক্তি উৎপাদনের আকর বলেই মনে করা হতো। কিন্তু কোয়ান্টাম অপটিকসের সাম্প্রতিক গবেষণার সাফল্য এক নতুন পর্বের সন্ধান দিয়েছে।

আসলে হ্যারোস এবং ওয়াইনল্যান্ডের গবেষণা নতুন এক যুগের সূচনা করতে চলেছে। এই কমপিউটিং শক্তি এবং যোগাযোগপ্রযুক্তির গতিশীলতা অন্যরকম এক বাস্তবতা তৈরি করেছে। হয়তো এর মাধ্যমেই একসময় সম্ভব হবে 'পার্টিকেল পদ্মমিশনের' মতো বিষয়গুলো। হয়তো বিস্ময়করই মনে হচ্ছে, কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানীরা অচিরেই মানবজাতিকে এক নতুন প্রযুক্তি উপহার দিতে যাচ্ছেন। এই প্রযুক্তি হবে অনেক বেশি মানববান্ধব।

এখন পর্যন্ত আমরা যতটা চাচ্ছি, ততটা যন্ত্রনির্ভর হতে পারিনি। সম্ভবত 'টোটাল অটোমেশনের' অর্ধেক পথও পাড়ি দেয়া সম্ভব হয়নি। বস্তুত টোটাল অটোমেশন হচ্ছে মানবীয় সব কর্মতৎপরতাকে কৃত্রিম করে তোলার প্রযুক্তি। সেটা এখনও আমরা হাতে পাইনি। গত একশ' বছরে অনেক কিছু হয়েছে, বিশেষত পরিবহন ও তথ্য বিশে-ষণ এবং তা কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে। এই পর্যায়ে এসে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছেন এবার সময় এসেছে প্রচলিত ধারার প্রযুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার বা ওই সব প্রযুক্তিকে বদলে দেয়ার। বিবর্তনের ধারায় নয়– উল-ক্ষন বা লিপ ফ্রগেরই পক্ষপাতি তারা। এজন্য আগে চাই বিজ্ঞানের নতুন উদ্ভাবন, যার ভিত্তিতে তৈরি হবে নতুন প্রযুক্তি।

আসলে সম্ভাবনা নিয়েই সব সময় পথ চলে বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান যখন পথ নির্দেশ করে তখনই শুধু বিস্ময়কর সব খেলা দেখাতে পারে প্রযুক্তি। নোবেল কমিটির মতে, 'ফোটন এবং চার্জযুক্ত পরমাণু নিয়ে সার্জ হ্যারোস এবং ডেভিড ওয়াইনফিল্ডের গবেষণার সাফল্য নতুন এক সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।' এতদিন তাত্ত্বিক পর্যায়ে থাকা এ বিষয় দুটি মানবসভ্যতায় যে কতটা অবদান রাখবে, তা এখনই সুস্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। কারণ, এর আগেও আমরা দেখেছি– যে সম্ভাবনা নিয়ে কমপিউটার তৈরি হয়েছিল তারচেয়ে অনেক গুণ বেশি কাজ তাকে দিয়ে করানো হচ্ছে। ইন্টারনেটকে প্রথমাবস্থায় যতটা কার্যকর মনে হয়েছিল তারচেয়ে তার উপযোগিতা বহু শতগুণ বেশি। কাজেই এই কোয়ান্টাম অপটিকস গবেষণা কমপিউটিং এবং যোগাযোগপ্রযুক্তির যে সম্ভাবনা প্রাথমিকভাবে দেখাচ্ছে, তা প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হলে আরও অনেক নতুন সাফল্যের জানালা খুলবে তা নিশ্চিত।

ফিডব্যাক : *abir59@gmail.com*